স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র।

মহাত্মা নবীন চন্দ্র রায় ১৮৩৭ খ্রীঃ ২০এ ফেব্রুয়ারী মিরাট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় ভদ্র লোক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে পঞ্জাব প্রদেশে যাইয়া অবস্থিতি করেন। নবীন চন্দ্রের পিতা তাঁহাদেরই এক জন। অতি শৈশবকালে নবীন চন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ হয়। বিদেশে বন্ধুহীন স্থানে বিধবা মাতা পুত্রকে লইযা বিপদগ্রস্তা হন। নবীন চন্দ্রের জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। পঞ্জাবে সে সময়ে উচ্চ শিক্ষা পাইবার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন নবীন চন্দ্রের মাতা তাহারও ব্যয় বহন করিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদ্যানুরাগী নবীন চন্দ্র দরিদ্রাবস্থার জন্য বিদ্যা উপার্জ্জনে বিরত হইলেন না। প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ রামায়ণ শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন, নবীনচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করাইতেন, বৃদ্ধ তাঁহাকে কিছু কিছু পয়সা দিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মিরাটে সে সময়ে ভাল বিদ্যালয় ছিল না।

মিরাট হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী সিরধনা নামক স্থানে একটি বিদ্যালয় ছিল। বালক নবীনচন্দ্র প্রত্যহ এই ৪ মাইল পথ হাঁটিয়া সেই বিদ্যালয়ে যাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এত কষ্টেও অধিক দিন পড়িতে পারিলেন না। বৃদ্ধা জননীর ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে হইল। সেই সময় তাঁহার বয়স ১২।১৩ বৎসর মাত্র। যে বয়সে অন্য বালকেরা নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়, বালক নবীনচন্দ্র সেই বয়সে সংসারের কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ১৬৲ টাকা বেতনের একটি কার্য্য হইল। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বলে শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। চাকুরী আরম্ভ করিয়া তিনি এক দিকে যেমন নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন, অপর দিকে আবার তেমনই জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লোকে বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই অধিকতর যত্ন শীল হয়, কিন্তু নবীনচন্দ্র সে রূপ ছিলেন না। সংসার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইল। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত ইংরাজী, পারসী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া উচ্চতর কঠিন গণিত

শাস্ত্র (ডাইনামিক্স্, ষ্টাটিক্স্, হাইড্রোষ্টাটিক্স্ সিভিলইঞ্জি-নিয়ারিং ইত্যাদি) শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্যের সাহায্য বিনা চিকিৎসা ও কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিলেন। এবং অল্প কালের মধ্যেই ঐ সকল বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই পঞ্জাব প্রদেশে নবীনচন্দ্রের বিদ্যা-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহাকে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিলেন; তিনি অতি দক্ষ-তার সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ওরিএ-ণ্টেল কলেজের অধ্যাপক কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, নবীনচন্দ্র তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত উর্দ্দু প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ উক্ত পদ পাইতে পারে না। নবীন চন্দ্র এ কার্য্যও সুদক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তিনি মাসিক নয় শত টাকা বেতনে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রেলওয়ের পে মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন এ দেশীয় এই কার্য্য প্রাপ্ত হন নাই।

নবীন চন্দ্র নিজে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াই পরিতৃপ্ত হই-তেন না। অপরকে সেই জ্ঞান দিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় নানা বিষয়ে

৩১ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দি ভাষার উন্নতির মূল নবীনচন্দ্র। তাঁহার প্রণীত হিন্দি ব্যাকরণ অদ্যাপিও পঞ্জাবের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। তিনি হিন্দি ভাষায় সাহিত্য, ব্যাকরণ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল, আহার-তত্ত্ব, স্ত্রী-শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও কৃষি-বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ প্রচার করিয়া পঞ্জাবে শিক্ষার এক নূতন আলোক প্রকাশ করেন। তিনি যখন যে প্রদেশে থাকিতেন, তখন সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেন। তিনি পঞ্জাবের ইংরাজী ভাষায় চালিত সোশ্যাল রিফর্ম্মার, ও আঞ্জুমানি পঞ্জাব এবং উর্দ্দু ভাষায় চালিত জ্ঞান-প্রদায়িনী, এই তিন খানা কাগজের সম্পাদক ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে যত কাল শিক্ষার নাম থাকিবে, ততকাল নবীন চন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে পঞ্জাববাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে। পঞ্জাব নবীনচন্দ্রের নিকট চিরঋণী।

নবীনচন্দ্রের বুদ্ধি শক্তি অতি প্রখর ছিল। তিনি অতি অল্প সময়ে ও সহজে কঠিন, দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকল বুঝিতে পারিতেন। তিনি যে এত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে অন্যের সাহায্য অতি অল্পই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি অবসর পাইলেই কিছু শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। এক সময় তাঁহাকে এক সপ্তাহ কাল উষ্ট্র পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে

হইয়াছিল; সেই সময় তিনি সমস্ত বীজগণিত উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুরাগ এত প্রবল ছিল যে তিনি অল্প বয়স্ক বালকদিগের সহিতও জ্ঞানালোচনা করিতেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া অবশেষে তিনি মধ্যভারতে রত্লামের মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এ কার্য্য তিনি এত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি রাজকীয় গুরুতর বিষয় সকল অতি বিজ্ঞতার সহিত মীমাংসা করিতেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা এত প্রবল ছিল যে তিনি যে যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাষায় যখন যে পুস্তক বা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত, তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। অন্যে যে সকল গ্রন্থ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দেয়, এমন এক খান বই পাইলেও নবীনচন্দ্র যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন "সকল গ্রন্থ হইতেই মানুষ শিক্ষা লাভ করিতে পারে।" তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল ছিল যে, তিনি মন্ত্রীর কার্য্য করিবার সময়েও পাণিনি ব্যাকরণের শ্লোক মুখস্থ করিতেন। কেহ তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "জ্ঞানের সীমা নাই মানুষ চিরকাল জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, আমার যতক্ষণ শক্তি থাকে পড়িব।"

তিনি বহু পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক নানা ভাষায় বিবিধ বিষয়ের বহু সংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ গৃহে এক বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এই পুস্তকালয়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থই অধিক।

তিনি কোন বিষয়ের আংশিক জ্ঞান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। যতক্ষণ না সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতেন, ততক্ষণ গাঢ় মনোযোগের সহিত তাহা শিক্ষা করিতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন তখন সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেন। এই কারণেই যে উপায়হীন বালক এক সময়ে রামায়ণ পাঠ করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন তিনিই আবার গবর্ণমেণ্টের নানা সম্মানিত উচ্চ কর্ম্ম করিয়া অবশেষে একজন মহারাজার প্রধান মন্ত্রিত্বে বৃত হইয়াছিলেন। ফলতঃ মানুষ স্বীয় প্রতিভা, অধ্যবসায় এবং সুশিক্ষার বলে অতি দরিদ্র অবস্থার মধ্য হইতেও কি প্রকারে পাণ্ডিত্য ও পদগৌরবে জনসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে নবীনচন্দ্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নবীনচন্দ্রের হৃদয় অতি দয়ালু ও প্রশস্ত ছিল। তিনি অন্যের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। যে কোন

প্রকারেই হউক দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মাসিক আয়ের কতক অংশ নিয়মিতরূপে দুঃখীদিগের সাহায্যে ব্যয়িত হইত। যে কোন ব্যক্তি নবীনচন্দ্রের নিকট আপনার আর্থিক অভাব জানাইত, তাহাকেই তিনি সাধ্যানুরূপ দান করিতেন। তিনি কোন সাহায্যপ্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতিদিন কিছু কিছু পরোপকার করা উচিত।" তিনি দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দান করিতেন। যাহারা গরীব, দুঃখী, যাহাদের রোগের সময় অর্থাভাবে চিকিৎসার সুবিধা নাই, তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার জন্যই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের যে কোন ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া নবীনচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিত, তাঁহার দয়ালু হৃদয় অবিলম্বে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইত। তিনি জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অভাবের সময় সকলকে সাহায্য করিতেন।

নবীনচন্দ্রের প্রাণ সুকুমার শিশুর ন্যায় সরল ছিল। তিনি কখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই সরলতার সুবিধা লইয়া কত ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। একজন ধূর্ত্ত দারিদ্র্যের ভাণ করিয়া

তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করে, দয়ালু নবীনচন্দ্র তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দান করেন, প্রবঞ্চক শেষে সুবিধা পাইয়া তাঁহার সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে এবং তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছিত করে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের হৃদয় এমনই কোমল ছিল যে তিনি এরূপ বিশ্বাসঘাতককেও একটী কটু কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিবারস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এমন ধূর্ত্তকে কেন বিশ্বাস করেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "সংসারে ভাল মন্দ নানা প্রকৃতির মানুষ আছে তোমরা লোকের কেবল মন্দের দিক্‌টা কেন দেখ ? তাহার ভাল গুণ গ্রহণ কর।"

তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা চির দিন একত্রে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা কোন দিন তাঁহার মুখে কর্কশ বাক্য শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ ছিল। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, নর নারী যাহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইত তাহাকেই তিনি আপনার করিয়া লইতেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মগণ কৃষি কার্য্য করিয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মধ্যভারতে খাণ্ডোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূমি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মগ্রাম নামে একটী গ্রাম সংস্থাপন করেন। তাঁহার সংকল্প ছিল গরীব ব্রাহ্মগণ তথায় যাইয়া

নিষ্কর ভূমি লইয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই।

তাঁহার জীবনে কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। তিনি যে দান করিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। গরীবদিগের সাহায্যে তিনি এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, যে অনেক সময় তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা কষ্টকর হইয়া উঠিত। তিনি নিয়মিতরূপে একটী পরিবারের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট এ বিষয় কেহ জানিতে পারে নাই।

তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল। কেহ কখনও তাঁহাতে ক্রোধ বা হিংসার ভাব দেখিতে পায় নাই। বরং নিঃস্বার্থ ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বভাবের সদ্গুণ রাশি যেন সর্ব্বদা তাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত মুখশ্রীতে প্রতিভাত হইত।

তিনি সকল প্রকার সৎকার্য্যেই উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন এবং তাহাতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। লাহোরের ওরিএণ্ট্যাল কলেজ, শিক্ষা সভা, ফিমেল নর্ম্যাল বিদ্যালয়, তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাঁহারই প্রধান উদ্যোগে লাহোরের ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনিই উদ্যোগী হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন।

দুঃখী শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ি গণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি নানা উপায়ে তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য তিনিই প্রথমে লাহোরে রজনী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।

নবীনচন্দ্রের নৈতিক জ্ঞান অতি উজ্জ্বল এবং চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ছিল। তাঁহাব ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়; কিন্তু শিশু-কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্কের কথা শুনিতে পায় নাই। স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাহাদিগকে জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তিনিই পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রধান ও প্রথম উদ্যোগ কর্ত্তা। তিনি এক দিকে যেমন আপনার চরিত্রকে উচ্চনৈতিক ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তেমনি অপরের জীবন যাহাতে সুনীতি পরায়ণ হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি "সোশ্যাল রিফরমার" নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। বাল্য বিবাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দূর করিয়া দেশে বিশুদ্ধ নীতি প্রচার উদ্দেশেই তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রুত কথা পালন করা তাঁহার চরি-

ত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তিনি নিয়মিতরূপে পরিশোধ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তিনি যখন যে কাজে নিযুক্ত হইতেন সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেন। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই উচ্চ নীতি পালন করিয়া গিয়াছেন।

যাহার প্রভাবে জীবন সার্থক হয়, মানুষ দেবতা হয়, সেই পবিত্র ও উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সরল প্রাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি সাংসারিক নানারূপ বিপৎপাতের মধ্যেও আশ্চর্য্য সাহস্কুতার সহিত ধর্ম্মসাধনে রত থাকিতেন। তাঁহার জীবনে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই ঘোর পরীক্ষার সময়েও ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকিতেন। শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা ভিন্ন কখন তাঁহার দৈনিক উপাসনা বন্ধ হইত না। তিনি অনেক সময়ে মহাযোগে, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। পরমাত্মার সহিত এই যোগ তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল।

ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। তিনি উপনিষৎ ও ভাগবৎ প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া ধর্ম্মের অমূল্য রত্ন সকল নানা ভাষায় প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-পিপাসু

ব্যক্তিদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। লাহোর নগর তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্রের কেন্দ্র স্থল ছিল। তিনি এখানে থাকিয়া নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। যাহাতে লাহোর-বাসী ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হয়, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতেন। তিনি লাহোর ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ৩১ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার ১১ খানি ধর্ম্ম বিষয়ে। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার ও পরোপকারার্থ তাঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয় করিতেন। তিনি ভারতীয় একেশ্বরবাদীসভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে নবীনচন্দ্রের মত অতি উদার ছিল। তিনি কখনও কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না। বরং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল সাধুদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। এবং তাঁহা-দিগের সঙ্গে আগ্রহের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার হৃদয় এতদূর ধর্ম্মপিপাসু ছিল, যে যেখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ হইত সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে যোগ দান করিতেন; এবং এমন গভীর অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের সহিত আলোচনা করিতেন যে লোকে দেখিয়া অবাক্ হইত।

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম ও অনেক অর্থ

ব্যয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি যখন যে প্রদেশে থাকিতেন তখন সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। পবিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করা ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

নবীনচন্দ্রের বড়ই বাসনা ছিল শেষ জীবন কলিকাতায় থাকিয়া ভগবানের সেবায় অতিবাহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি গৃহও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই বক্রমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবার তাঁহাকে পিতার অমৃত নিকেতনে যাইতে হইবে। তাই পিতার বিশ্বাসী সন্তান পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। একদিন একজন আত্মীয় তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, "আর ইহলোকে আশা নাই, পরলোকে আমার সমস্ত আশা

গিয়াছে। তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যে এই শরীরের সহিত আত্মার যে সংগ্রাম হইতেছে, তাহা যেন শীঘ্র শেষ হয়।" স্ত্রী ও কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা বিশ্বাসী হও, কোন বিপদ থাকিবে না।" তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বাহিরের চিন্তা দূর করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা কেবল ভগবানের নাম, ও আনন্দ ধামের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। এই সময় তিনি

"দয়াল দানৃত গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে,"

বার বার এই সঙ্গীতটি শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এই সঙ্গীতের সময় তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি আরও প্রশান্তভাব ধারণ করিত। তিনি বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া ভাবে মগ্ন থাকিতেন। দুই চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পতিত হইত। সঙ্গীতান্তে ভক্তির সহিত ঈশ্বরোদ্দেশে প্রণাম করিতেন। একদিন এক জন ব্রাহ্ম যুবককে একটী সঙ্গীত করিবার অনুরোধ করিলে তিনি নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী করেন ;—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল,
সকল দুঃখ হবে মোচন ;

শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে,
প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ,
না জান কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে,
ভুলিল চরাচর ;
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ ;
বিমল বিভুগুণ বন্দন,
কোটি চন্দ্র তারা উল্লসিত,
নৃত্য করিছে অবিরাম ॥

এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তিনি এতদূর পরিতৃপ্ত হইলেন যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে হাত যোড় করিয়া যুবককে বলিলেন "আপনি দয়া করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে এই গানটী শুনান আমি বড় অনুগৃহীত হইব।"

ভক্ত নবীনচন্দ্রের প্রাণ জীবিতাবস্থায় সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ থাকিত, মৃত্যুর সময় কি তিনি তাঁহার হৃদয়ের দেবতাকে ভুলিতে পারেন ? মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে নিমগ্ন ছিল। তিনি বলিলেন, "মা আমাকে পরম সুন্দর লোক হইতে ডাকিতেছেন, তোমরা আমায় রাখিতে পারিবে না।" ভগবান ভক্ত বৎসল। তাঁহার এমন বিশ্বাসী সন্তান তাঁহার

নিকট যাইতেছেন, তিনি কি তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন? তাহা কথনই নহে। ভক্ত নবীনচন্দ্রকে বিশ্বজননী দয়া করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে নবীনচন্দ্র ধ্যান নিমগ্ন হইলেন! ক্রমে তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর অথচ প্রসন্ন হইয়া আসিল। দুই চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। নবীনচন্দ্র দুই হাত যোড় করিয়া বলিলেন "মা, তোমার রূপ এত সুন্দর তাহা ত আগে জানিতাম না, আহা! তুমি কি সুন্দর!"

এই ভাবে ব্রহ্মযোগে ভক্ত নবীনচন্দ্র সে রাত্রি অতি-বাহিত কবিলেন। তৎপর দিবস তাঁহার যাত্রার দিন।

আজ তাঁহার প্রাণে কত আনন্দ। কেবলই আনন্দ ধামের কথা বলিতে লাগিলেন। আর ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মায়ের রূপ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা বলিলেন, "বাবা, আমরা তোমার অনুপযুক্তা কন্যা, তোমার সেবা করিতে পারিলাম না, বল. কি কবিলে তুমি সুখী হইবে।" ধার্ম্মিক পিতা বলিলেন "তাঁহার সেবা কর।" সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "এখানে সকলের সহিত প্রেমে ও সদ্ভাবে বাস কর।"

তৎপরে উপস্থিত বন্ধুগণকে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে বলি-লেন। সকলে সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আনন্দ

ধামের যাত্রী ভক্ত নবীনচন্দ্র হাত জোড় করিয়া প্রাণ ভরিয়া বিশ্ব জননীকে ডাকিতে লাগিলেন, দুই চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার শ্বাস বায়ু মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাঁহার মুখের উপর উচ্চৈঃস্বরে "সত্যং জ্ঞানমন্তম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের বিশ্বাসী সন্তান, ভগবানের নাম করিতে করিতে অমৃতধামে যাত্রা করিলেন। ১৮৯০ সনের ২৮ এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় নবীনচন্দ্রের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করে।

নবীন চন্দ্রের পবিত্র আত্মা পবিত্রলোকে গমন করিয়াছে। স্বর্গের দেবতাগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আনন্দ মনে পরম পিতার নিকট দেবগণের সহিত একাসনে বসিয়া প্রেমসুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার জড় দেহ অগ্নিতে ভস্মিভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে তাঁহার কি স্মৃতি থাকিল?—তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাময় ধর্ম্মজীবন। তিনি যে আদর্শ-জীবন আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে আমরা ধন্য হইতে পারিব।

পঞ্জাব বিশেষ ভাবে নবীনচন্দ্রের নিকট ঋণী। তিনিই

পঞ্জাবীদিগের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ক সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল কারণ। নবীনচন্দ্রের বিয়োগে তাঁহারা একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু হরাইয়াছেন।

নবীন চন্দ্র স্বীয় জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্মবিশ্বাস-পূর্ণ জীবন দ্বারা জনসাধারণকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সততা, অধ্যবসায়, ও প্রতিভা বলে মানুষ অতি গরীব অবস্থার মধ্য দিয়াও জনসমাজে কত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং কি প্রকারে নিঃস্বার্থ প্রেমে চালিত হইয়া মানুষ পরের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতে পারে, আর কি প্রকারে নানা রূপ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ভগবানের বিশ্বাসী সন্তান উচ্চ ধর্ম্ম জীবন সাধন করিয়া, অবশেষে ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রসন্ন চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, নবীন চন্দ্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভগবান এই সাধু পুরুষের জীবন দ্বারা আমাদিগকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে যাইবার জন্য প্রস্তুত করুন।

নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে দেশীয়, ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, হিন্দি প্রভৃতি সংবাদ পত্রে আলোচনা হয়। সময়াভাবে সকল কাগজের মতামত প্রকাশ করিবার সুবিধা হইল না। কেবল কয়েক খানার মত দেওয়া গেল।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার" এই কথা বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন ;—"মধ্য ভারতের একজন বড় ও ধার্ম্মিক এবং ব্রাহ্ম সমাজের একটী স্তম্ভ স্বরূপ একজন মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়, যিনি প্রত্যেক শিক্ষিত পঞ্জাবীর নিকট সুপণ্ডিত, স্বদেশ হিতৈষী, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের বন্ধু বলিয়া পরিচিত, তিনি আর ইহলোকে নাই।

* * * * * * *

এই মহাপুরুষের পরলোক গমনে আমাদিগের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহার বহু সংখ্যক বন্ধু এবং প্রশংসাকারী দিগের সঙ্গে একত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ভিন্ন তাহা আর কিসের দ্বারা আমরা প্রকাশ করিতে পারি? তিনি যেমন ইহ জগতে পরমেশ্বরের সেবা এবং মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে তাহার তেমনি পুরস্কার প্রাপ্ত হউন।"

তত্ত্বকৌমুদী ১৬ই ভাদ্র, ১২৯৭।

"আমরা গভীর দুঃখের সহিত ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে জানাইতেছি যে, অল্পদিন হইল আমরা ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছি। পাঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ও হিতৈষী নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট সুপরিচিত।

কয়েক দিন হইল ইনি পরলোক গত হইয়াছেন। ইঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে লাহোরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রতিষ্ঠা অবধি তিনিই উক্ত সমাজের প্রধান সহায় ও বন্ধুরূপে তাহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থসাহায্যে উক্ত সমাজের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বাবধি যে ক্ষুদ্র দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন,নবীনবাবু তাহার মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। তৎপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি বিধিমতে ইহার সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই।

নবীনচন্দ্র অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মগণের—ব্রাহ্মগণের কেন, এদেশের লোকের দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে, * * * * *।”

“নবীনচন্দ্র রায়—বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা শোকাতুর হইয়াছি। গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় আমাশয় রোগে তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে জ্ঞানে মানে অতি সুবিখ্যাত ছিলেন। ইনি রাজপুতনা রেলওয়ের পে-মাষ্টার ছিলেন, ইনিই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া যখন পেন্সন গ্রহণ করেন, তখন রতলাম রাজ্যের নায়েব দেওয়ান হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যত ভাষা প্রচলিত, তাহার প্রধান প্রধান সকল ভাষাতেই ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষ ইহাঁর উন্নত চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া ইহাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। গত বৃহস্পতিবার চারিটার পর ইহাঁর মৃতদেহ নিমতলা ঘাটে নীত হয়। বহুসংখ্যক ভদ্রলোক শোকাকুল হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।" [সঞ্জীবনী।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নবীনচন্দ্রের মৃত্যুতে এই মর্ম্মে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করত সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন। পণ্ডিত নবীনচন্দ্র দীর্ঘকাল সাধারণ ব্রহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি পঞ্জাব অঞ্চলে বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ পূর্ব্বক এবং সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় জীবনের পবিত্রতা এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস প্রচার করত ব্রহ্মসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

স্থির হইল যে, কমিটী এই ঘটনা উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মার

শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আপনাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন।"

নবীন বাবুর মৃত্যুর দিন রতলামের মহারাজের হইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী নবীনবাবুর সহধর্ম্মিণীর নিকট নিম্নলিখিত সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রামটী প্রেরণ করেন।

"আপনার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মহারাজা তাঁহার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আপনার স্বামী এক জন যে যথার্থ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

থিইষ্টিক কন্‌ফারেন্স্‌ নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারণ স্থির করেন—

"স্থির হইল যে, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়ের অসাময়িক মৃত্যুতে সাধারণ ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের এবং বিশেষ ভাবে এই সভার যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এই সভা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন।"

নবীনচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ;—

"স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত আমার বহু বৎসরের আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার প্রীতি সূত্রে ও অপূর্ব্ব চরিত্রের গুণে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহার পরিবার পরিজনের সহিত আমার পরিবার পরিজন গণের রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা নিকট

সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। নানা প্রকার অবস্থায় তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার যে গুণগুলি দেখিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা এই:—(১ম) তিনি একটী দিনের জন্য মানবজীবনের মহৎ লক্ষ্য ভুলিতেন না। যদিও বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, বিষয় তাঁহার উপলক্ষ্য, জীবনের মহত্ত্বসাধন প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রতিদিন কিছু না কিছু জ্ঞানালোচনা, এবং কিছু না কিছু পরোপকার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের পালনীশক্তিতে তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন—"আমি কোন বিপদে ভয় পাই না, কোন নিরাশকর ঘটনাতে নিরুৎসাহ হই না। আমার বিগত জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে দেখিতেছি, আমার রক্ষক রহিয়াছেন।" তৃতীয়তঃ তাঁহার বিনয়—এরূপ বিনয় ও সৌজন্য আমি একালের মানুষে প্রায় দেখিতে পাই না। একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের নিকট ও সেই পঞ্চশতাধিক প্রবীণ, বিনয়ে নত ছিলেন। দুই জনে টেবলের দুই ধারে বসিয়া কাজ করিতেছি, ইতিমধ্যে তাহার একটা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইলে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতেছেন, আমি কখন মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিব। ডাকিতে কুণ্ঠিত। চতুর্থতঃ তাঁহার উদারতা, তাঁহাকে যাহারা প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক সময়ে কথা হইয়াছে।

আমি অনেক সময় তাহাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মুখে এক দিনও একটী রুক্ষ কথা শুনি নাই। তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপার ভাবই দেখিতাম, আক্রোশ বা প্রতিহিংসার ভাব কখনও দেখি নাই। তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি সম্প্রদায় ভেদ জানিত না। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকদিগকে তিনি শিষ্যের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার আরও কত সদ্‌গুণ দেখিয়াছি, তাহা সবিস্তর বর্ণন করিতে গেলে পত্র বাহুল্য হয়। ঈশ্বরের চরণে এইমাত্র প্রার্থনা, সেইগুণ রাশি, সেই সৌম্য মূর্ত্তি চির দিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া আমাকে উন্নত করুক।"

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র বাবু বড় নীরব লোক ছিলেন—পাছে তাঁহার গুণের কথা কেহ জানে, এই ভয়ে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জীবনের কথা প্রায় কিছুই জানেনা। তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু সত্যপ্রিয় দেবের অবগতির জন্য সংক্ষেপে ইংরেজীতে আত্মইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহারই অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

আত্ম-ইতিহাস—"আমার পিতার নাম বাবু ব্রজকিশোর দেব। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত জনাকীর্ণ কোন্নগর সহরে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা একরূপ জানিতেন, ইংরেজীও একরূপ পড়িতে ও বলিতে পারিতেন। তিনি সৈন্যবিভাগে সরকারের কাজ করিতেন। সরকারের কাজ তখন সম্মানজনক ছিল। সৈনিক কর্ম্মচারীদের সহিত সর্ব্বদাই কাজ করিতে হইত, কাজেই ইংরেজী পড়িতে ও বলিতে শিখিয়াছিলেন।

বৃদ্ধবয়সে সামান্য পেন্সন লইয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সৎসাহসী, কার্য্যশীল, চরিত্রবান ও খুব পরিমিতাচারী ছিলেন। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার ও দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ঠিক সময় মত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য, সঙ্গে সর্ব্বদাই ঘড়ী রাখিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮৪৬ সনে ৯৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র, তাঁহার এই চারি পুত্র। ভৈরবচন্দ্র ১৮৩৩ সনে, মহেশচন্দ্র ১৮৫৫ সনে, এবং ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭৬ সনে পরলোক গমন করেন।

জন্ম ও বাল্যকাল—"আমি তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। ১৭৩৩ শকের ৬ই শ্রাবণ, ১৮১১ সনের ২০ এ জুলাই কোন্নগরে আমার জন্ম হয়। তখন কোন্নগরে কোন বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করি নাই। আমার শিক্ষার জন্য পিতা ঠাকুর এক জন গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অতি সামান্য রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখিয়াছিলাম।

যখন আমার বয়স ১০ বৎসর, তখন গৃহে সামান্য রকম ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি। আমার আত্মীয় বাবু মদন-

মোহন মিত্র আমাকে পড়াইতেন। তাঁহার নিকট বানান, পাঠ ও শব্দার্থ মুখস্থ করিতাম।

১১ বৎসর বয়সের সময় আমি মাতৃহারা হই। তার পর দুই বৎসর কাল পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। তখন শুনিলাম, কলিকাতায় ভাল ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে পড়িতে আমার খুব ইচ্ছা হইল। আমার পিতা আমাকে খুব ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার বড় বেশী রাগ ছিল, সেই ভয়ে মনের কথা তাঁহার নিকট বলিতে সাহসী হইলাম না।

মুখে বলিতে সাহসী না হইয়া, আমাকে কলিকাতার কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য, বাবু উমাচরণ দেবের দ্বারা পিতার নিকট এক দরখাস্ত লিখাইলাম। একদিন মধ্যাহ্নে পিতা ঘুমাইয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বদাই একটা বাক্স থাকিত; সেই বাক্সের উপর দরখাস্ত খানা রাখিয়া দিলাম। পিতা জাগিয়া আমার পত্র পড়িলেন, এবং আমাকে ডাকিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন।

১৩ বৎসর বয়সের সময়, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমি কলিকাতায় যাই। আমি হাটখোলার বাবু রামনারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে বাস করি, এবং রীড সাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই। সেখানে ৮ মাস ছিলাম। সেখানকার পাঠে সন্তুষ্ট না হইয়া, আমি পিতার নিকট হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইবার

অভিলাষ জানাইলাম। ১৪ বৎসর বয়সের সময়, ১৮২৫ সনের ১লা আগষ্ট আমি হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

হিন্দু কলেজে ৬ বৎসর ৫ মাস কাল অধ্যয়ন করি। শেষ দুই বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং মাসে ১৬ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতাম। কালেজের বন্ধুদের মধ্যে নিম্নলিখিত লোকদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেভারেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। বাবু হরিমোহন সেন আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কলেজে পাঠের সময়, হরিমোহন বাবু ও আমি আরব্য উপন্যাসের কিয়দংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলাম।

গবর্ণমেণ্ট চাকুরী।—কালেজের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ১৮৩১ সনের ২০এ ডিসেম্বর কলেজ পরিত্যাগ করি, এবং মাসে ৩০ টাকা বেতনে, গ্রেট ট্রিগনো মেট্রিক্যাল সার্ব্বে অব ইণ্ডিয়ার কম্পিউটার নিযুক্ত হই। আমার বেতন শীঘ্রই ৪০ টাকা হইয়াছিল। ১৮৩৮ সনের ২০ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমি গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তার পর বোর্ড অব

রেভিনিউ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বালেশ্বরের ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হই। এই কাজ পাওয়ার পূর্ব্বে আমি সার্ব্বে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হই।

বালেশ্বরে ৬ বৎসরাধিক কাজ করিয়াছিলাম। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৪ সনের ৯ই জানুয়ারী আমাকে ৩য় বিভাগ হইতে ২য় বিভাগে উন্নীত করেন।

১৮৪৪ সনের মে মাসে আমি বদলী হইয়া মেদিনীপুরে যাই। এখানে সেটল্‌মেণ্ট ও বাটোয়ারা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১ম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হই।

১৮৫০ সনের জানুয়ারী মাসে ২৪ পরগণায় বদ্‌লী হই। এখানে পঞ্চান্ন গ্রাম ও অন্যান্য খাস মহলের রাজস্ব আদায়, খাজনার মোকদ্দমা, এবং সাধারণ কার্য্যের জন্য যে ভূমি গ্রহণ করা হয়, তাহার মূল্য নিরূপণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। প্রথমতঃ ৩ শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর ছিল। ১ম শ্রেণীর ৪৫০, ২য় শ্রেণীর ৩৫০ ও ৩য় শ্রেণীর ২৫০ টাকা বেতন ছিল। ৫ বৎসর পরে কর্ম্মচারীরা উন্নীত হইতেন। ১৮৫৩ সনে রেভিনিউ বোর্ড ডেপুটী কালেক্টরদিগকে যোগ্যতানুসারে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ১ম শ্রেণীর ৭০০, ২য় শ্রেণীর ৬০০, শত এই রকমে বেতন নির্দ্ধারণ করেন। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর

বেতন ২০০ শত করা হয়। এই নির্দ্দেশানুসারে আমি ১৮৫০ সনের ৬ই মার্চ্চ ২য় শ্রেণীভুক্ত হই, এবং আমার বেতন ৪৫০ হইতে ৬০০ শত হয়। এই সময় বেলেঘাটা হইতে চিৎপুরের নিকট গঙ্গা পর্য্যন্ত এক খাল কাটার প্রস্তাব হয়, এবং আমি তাহার জন্য ভূমি গ্রহণ কার্য্যে নিযুক্ত হই।

১৮৫৭ সনে একদিন রেলে যাইতেছি, সেই গাড়ীতে কয়েক জন ইংরেজ ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হয়। কথাবার্ত্তার পর ইংরেজেরা মনে করিলেন যে, আমি ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করি। ইংরেজেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাতে, গবর্ণমেণ্ট আমার কৈফিয়ৎ তলব করেন। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার যথাযথ বর্ণনা করাতে এবং আমার চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে, আমার কথায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইলেন।

১৮৫৮ সনের ২৯এ নবেম্বর রেলওয়ে কমিশনার এনশ্লি সাহেবের অধীনে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। ৮৬০ সনে এই কার্য্য শেষ করিয়া ৩ মাসের অনুগ্রহ বিদায় পাই। এই সময় বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের

সহিত স্বাস্থ্যলাভের জন্য উত্তরপশ্চিমে গমন করি। বিদায়ের পর আবার ২৪ পরগণায় যাই। ১৮৫৯ সনের ১০ই ডিসেম্বর ১ম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টব নিযুক্ত হই। ১৮৬০ সনের ২৪ এ মার্চ্চ গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন, এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেন। ঐ বৎসর ১৯এ সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ছাড়া কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হই। সুতরাং একদিন আলিপুর ও একদিন কলিকাতায় কাজ করিতে হইত।

অবসর গ্রহণ—স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৬৩ সনের ১লা জানুয়ারী আমি রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করি, এবং মাসিক ৩৩০॥০ আনা পেন্সন প্রাপ্ত হই।

মিউনিসিপাল কমিশনার—১৮৬৫ সনে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নিযুক্ত হই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করি।

সব রেজিষ্ট্রার—১৮৭১ সনের ৪ঠা জুলাই শ্রীরামপুরের সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে ঐ কার্য্য ত্যাগ করি।

বিবাহ রেজিষ্ট্রার—১৮৭২ সনের ৪ঠা জুন ১৮৭২ সনের

৩ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হই, এবং ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ঐ পদ ত্যাগ করি।

সনন্দ।—১৮৭৭ সনে মহারাণী যখন ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন ছোটলাট বাহাদুর আমাকে সার্টি-ফিকেট অব অনার প্রদান করেন।

পারিবারিক কথা।—১৮২৬ সনে ১৫ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোপালনগরের বাবু বৈদ্যনাথ ঘোষের দ্বিতীয় কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। তখন আমার স্ত্রীর বয়স ৯ বৎসর ছিল। এই বাল্য বিবাহ আমার ও আমার স্ত্রীর পিতা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আমার কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে, এই বিবাহ কখনও আমার কষ্টের কারণ হয় নাই। বরং আমি এমন প্রেমাস্পদা স্ত্রী পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বুদ্ধি, ধর্ম্মপ্রবণতা ও আমার প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এই বিবাহে আমার ছয় কন্যা ও এক পুত্র হইয়াছে। আমার প্রথমা কন্যা কৈলাস কামিনী ১২৪২ সনে, দ্বিতীয়া কন্যা মোক্ষদা ১২৪৬ সনে, তৃতীয়া কন্যা বিনোদা ১২৫০ সনে, চতুর্থ কন্যা ক্ষীরদা ১২৫২ সনে, পঞ্চম কন্যা ক্ষেমদা ১২৫৪ সনে, এবং ষষ্ঠ কন্যা বামা-

সুন্দরী ১২৫৬ সনে জন্ম গ্রহণ করে। আমার একমাত্র পুত্র সত্যপ্রিয় দেব বাঙ্গলা ১২৬৩ ইংরেজী ১৮৫৬ সনের ২২ এ জুলাই জন্ম গ্রহণ করে।

বাসগৃহ—আমার পিতৃ-গৃহ অত্যন্ত ছোট ছিল, সুতরাং সকলে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত না। আমি পুরাতন বাটীর সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমি পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এক বাটী নির্ম্মাণ করি। ১২৭৫ সন হইতে ঐ বাটীতে বাস করিতেছি।

শোক দুঃখ—১৮৫৯ সনে আমার বড় জামাতা বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বড় শোকাচ্ছন্ন হই। তিনি বহু-দিন "বেঙ্গলী" সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি লেখা পড়ার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। ১৮৮৩ সনে আমার তৃতীয়া কন্যা বিনোদার ও ১৮৮৩ সনে আমার দ্বিতীয় জামাতার মৃত্যু হয়। অতঃপর অনেকগুলি দৌহিত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মানুষ এই সকল শোক দুঃখের হাত কখনও এড়াইতে পারে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল ক্লেশ সহ্য করা কর্ত্তব্য।

পুত্রের বিবাহ—আমার পুত্র ১৮৭৬ সনে ১৮৭২ সনের ৩ আইনানুসারে বাগবাজারের বাবু কালীনাথ বসুর বড় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

গ্রন্থ প্রচার—আমি এনড্রুকোমের ও অন্যান্য লোকের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া শিশুপালন নামক গ্রন্থ লিখি। ১৮৫৭ সনে তাহার প্রথম ভাগ এবং ১৮৬২* সনে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬৭ সনে অধ্যাত্ম্য বিজ্ঞান নামক প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করি।

সামাজিক কথা।

কোন্নগর হিতৈষিণী সভা—১৮৫০ সনে আমি মেদিনীপুর হইতে ২৪ শ পরগণায় বদলী হই। তখন সপ্তাহের ছয় দিন খিদিরপুর অথবা আলিপুরে থাকিতাম, শনিবার কোন্নগর যাইতাম, আবার সোমবার ফিরিয়া আসিতাম। এই সময় আমার জন্মভূমি কোন্নগরের অবস্থা উন্নত করিতে, বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়। ১২৫৯ সনের ২৯ এ আষাঢ় আমি এক প্রকাশ্য সভায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া "কোন্নগর হিতৈষিণী" নামে এক সভা স্থাপন করি (১) কোন্নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, স্থানীয় লোকের উপকার করা, (২) ধর্ম্ম ও জাতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া গ্রামের অশ্লীল ও দূষিত আচার ব্যবহার রহিত করা, (৩) দুঃখীকে সাহায্য করা ও (৪) আপোষে বিবাদ মীমাংসা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভা ৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া স্থানীয় লোকের যথোচিত সাহায্য না পাওয়াতে ১৮৫৩ সনে

উঠিয়া যায়। এই সভা অনেক স্থানে রাস্তা সংস্কার, পুল নির্ম্মাণ, দরিদ্রের সাহায্য, স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন।

কোন্নগর স্কুল—এই সভা কোন্নগরে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করাতে আমি এক খণ্ড ভূমি দান করি। সেই ভূমির উপর সাধারণ চাঁদায় গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৫৪ সনের ১লা মে স্কুল খোলা হয়।

বাঙ্গালা স্কুল—লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশানুসারে কোন্নগরে একটী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৫৬ সনে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। আমার ও বন্ধুদের চেষ্টায় ১৮৫৮ সনে একটী বাঙ্গালা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠাগার—সাধারণ পাঠাগারের দ্বারা শিক্ষার সাহায্য হয়, এই ধারণা হওয়াতে আমি চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। এই চাঁদা দ্বারা ইংরেজী বিদ্যালয়টী দ্বিতল করিয়া তাহাতে পাঠের জন্য পুস্তক রাখা হয়। ১৮৫৮ সনের ১লা এপ্রিল এই পাঠাগার খোলা হয়। এখানে বহু সংখ্যক ইংরেজী, বাঙ্গলা ও প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

স্ত্রীশিক্ষা—ছাত্রাবস্থাতেই আমি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করি, আমি স্বয়ং সর্ব্ব প্রথমে আমার স্ত্রীকে সাধ্যমত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। পণ্ডিত রাখিয়া আমার কন্যা-

দিগকে শিক্ষিত করি, একটি কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়াছিলাম।

বালিকা বিদ্যালয়—১৮৫৮ সনে আমি গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখি যে, গবর্ণমেণ্ট যদি কোন্নগরে বালিকা বিদ্যালয় গৃহের জন্য ৫ শত টাকা দেন, তবে আমিও ৫ শত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি এবং গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা সাহায্য করিলে স্থানীয় লোকের নিকট হইতে ১৫ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে আমি ১৮৬০ সনের ১২ই এপ্রিল নিজ ভবনে বালিকা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করি। ইহার পর নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি।

কোন্নগর ষ্টেসন—১৮৪৪ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল খোলা হয়। তখন কোন্নগরে ষ্টেসন ছিল না। কোন্নগরবাসীদের ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বালী বা শ্রীরামপুর যাইতে হইত। আমি রেল কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট কোন্নগরে ষ্টেসন স্থাপন করিতে অনুরোধ করি। অনেক আন্দোলন করার পর কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৮৫৬ সনে ষ্টেসন স্থাপন করেন।

পোষ্টাফিস—পোষ্টাফিস না থাকাতে লোকের বড় অসুবিধা হইত, বালী বা শ্রীরামপুর না গেলে চিঠি পাওয়া যাইত না।

১৮৫৮ সনে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে কোন্নগরে পোষ্টাফিস স্থাপন করিতে অনুরোধ করি এবং ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে অঙ্গীকার করি, ঐ বৎসরেই কোন্নগরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়—হিতৈষিণী সভা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হোমিও প্যাথি মতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ১৮৬৮ সনে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করি। সভার অনুমতি অনুসারে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু পরবৎসর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন।

১৮৭৫ সনে কোন্নগরে খুব মেলেরিয়া জ্বর হয়। আমার ও বন্ধুবর্গের যত্নে গবর্ণমেণ্ট এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আমারই এক গৃহে এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, ১৮৮১ সনে গবর্ণমেণ্ট ইহা বন্ধ করিয়া দেন। তারপর আমার স্ত্রীর ব্যয়ে আমার ভবনে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।

ধর্ম্ম কথা—আমি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং

বিবাহের পর সস্ত্রীক গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন কালী পূজা করিতাম। যখন আমি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন সুবিখ্যাত ডিরোজিও সাহেব সে শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। কলেজ ও কলেজের বাহিরে তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইত। কিয়ৎকালের পর আমার আর হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিল না, আমি একেশ্বরবাদী হইলাম। কিন্তু তখন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া বাহিরে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ১৮৪৪ সন পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিয়া গেল, আমি বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুর বদলী হইলাম। এখানে এক দিন একখণ্ড তত্ত্ববোধিনী পাইয়া তাহা পাঠ করিলাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত অবগত হইয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। আমি সেই দিন হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলাম ও পত্রিকার উপদেশানুযায়ী পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ১৮৪৬ সনে মেদিনীপুরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করি এবং আমি যতকাল তথায় ছিলাম ততকাল সমাজ জীবিত ছিল। তার পর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসু সমাজ পুনর্জ্জীবিত করেন এবং সমাজকে মহা শক্তিশালী করিয়া তুলেন।

২৪ শ পরগণায় আসিবার পর আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম

ধর্ম্ম গ্রহণ করি এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হই। ঈশ্বরের কৃপায় আমি পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার স্ত্রী প্রাণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন এবং কার্য্যে সে ধর্ম্মের আদেশ পালন করেন। আমার সন্তান গণও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন।

১৮৬৩ সনে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ বৎসর ২৮এ মে নিজ গৃহে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করি। প্রথমতঃ প্রতি পক্ষে, তার পর সপ্তাহে একবার সামাজিক উপাসনা হইত। সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সমাজ প্রথমতঃ আদি সমাজের অঙ্গীভূত ছিল—তার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন, কিন্তু এ সমাজ চিরকালই স্বাধীনভাবে উভয় সমাজের নেতাদিগকে উৎসবের সময় আচার্য্যের কার্য্য করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি চিরদিনই আমার অত্যন্ত ভক্তি আছে। সমাজের জন্য মন্দির নির্ম্মাণার্থ নদী-তীরে আমি এক খণ্ড ভূমি দান করি। ৩ সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সনে মন্দির প্রবেশ হয়—বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত,

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি দেব, সত্যপ্রিয় দেব তাহার ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রচারক বা আচার্য্যের বাসের জন্যও সমাজের নিকট বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

যে সকল ঘটনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় তাহা সকলেই জানেন। আমি ইহার সংস্থাপনের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। প্রথম হইতে ১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত আমি এই সমাজের সম্পাদক ছিলাম। ১৮৮০ সনে আমি সভাপতি নিযুক্ত হই, কিন্তু আমি আপনাকে এ কাজের নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করিতাম। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে একাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হই। ক্রমাগত ৫ বৎসর এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মধ্যে এক বৎসরের পর ১৮৮৭ সনে আবার সভাপতি হই, ১৮৮৮ সনে আমি অবসর গ্রহণ করি।

আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে কোন্নগরের গোঁড়া হিন্দুগণ আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে অপমানিত করিতে ও সুবিধা পাইলে নিপীড়ন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নই। তাঁহারা যে এরূপ আচরণ করিবেন তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি দিন,

তাঁহারা আত্ম-ভ্রম দেখিয়া আপনাদের আচরণ সংশোধন করিতে শিক্ষা করুন।

স্বাস্থ্য— যদিও স্বভাবতঃ আমি দুর্ব্বল তথাপি মিতাচার ও মিতাভ্যাসের জন্য ঈশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি। আমি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আলোচনা করিয়া তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার আহার সামগ্রী অতি সামান্য রকম। ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ ও রুটি ভিন্ন আর কিছু খাই না। আমি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠি, প্রথম রাত্রেই নিদ্রা যাই। এই নিয়ম চিরদিন পালন করিয়াছি। প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা, কাফি বা কোকো পান করিয়া ভ্রমণ করি এবং ডমবেল ও ফ্লেশ ব্রস লইয়া ব্যায়াম করি। এখন প্রাতঃকালে দুধ ভিন্ন আর কোন তরল দ্রব্য পান করি না। কিছু না খাইয়া খালি পেটে কখনও বাড়ীর বাহির হই না।

আমার প্রাত্যহিক কার্য্যের তালিকা এই ;—বৎসরের সকল ঋতুতেই ৫ টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ বা সংবাদ পত্র পাঠ করি। ৬॥ বা ৭টার সময় এক পোয়া দুধ ও একখানা এরোরুট বিস্‌কিট খাই। তার পর ভ্রমণ করিতে যাই। ফিরিয়া আসিয়া সাংসারিক বা সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করি। ১০ টার সময় ঈষদুষ্ণ জলে শরীর প্রক্ষালন করি ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দি। স্নানের

সময় ফ্লেশ ব্রস ব্যবহার করিয়া থাকি। দুর্ব্বলতা বশতঃ এখন আর ডমবেল লইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না। স্নানের পর পারিবারিক উপাসনা করি। ১১ টার সময় ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, একটু মিঠাইয়ের সহিত এক পোয়া দুধ খাই। আহারের ৩। ৪ ঘণ্টা পরে জল খাই। তার পর আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পাঠ করি বা কোন কাজ করি। ৫ টার সময় ডাক্তারের ব্যবস্থা মতে ৫ ফোটা টিংচার ওপিয়াই (পেটের অসুখের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল) সেবন করি। কিছু অন্ন অথবা বিস্‌কিট ও বাতাসা খাই। ৭ টার সময় ৩।৪ খানা ছোট রুটী অথবা কয়েক টুকরা পাউরুটী, মাছের তরকারী, এক পোয়া দুধ ও কিছু মিঠাই খাই। তারপর পরিজনবর্গ বা বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করিয়া রাত্রি ৯ টার সময় নিদ্রা যাই। এখন (১৮৮৮ সনের জুলাই) আমার বয়স ৭৭ হই-য়াছে। যদিও কখনও কখনও শরীর বিকল হইয়া যায় তথাপি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে এখনও এক রকম সুস্থ শরীরে আছি। দুর্ব্বলতাই এখন আমার প্রধান পীড়া।”

শিবচন্দ্রের সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

“৺বাবু শিবচন্দ্র দেব—ক্রমেই সে কালের সহিত

এ কালের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা বঙ্গদেশের গৌরব ছিলেন, একে একে তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন। যাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি চারিদিকে সূর্য্যের ছটা বিকীরণ করিত, ক্রমে তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেছেন। সেকালের শিক্ষিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মাদের মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। বিগত বুধবার প্রাতে ৬টার পর বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ও মহা-যাত্রা করিয়াছেন। যাঁহারা জন সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ, তাঁহারা চলিয়া গেলে সংসার শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়। শিবচন্দ্র বাবুর অভাবে আজ বঙ্গদেশে শোকের গভীর ছায়া পড়ি-য়াছে। বঙ্গের কৃতিমান সন্তানগণ চলিয়া যাইতেছেন, আমরা অসার অপদার্থ লোকগুলি জন্মভূমির কোন দুঃখই দূর করিতে পারিনা, আমরাই পড়িয়া রহিলাম।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, কিন্তু বড় দুর্ব্বলতা বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কোন জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, নীরবে জীবাত্মা ক্ষণভঙ্গুর দেহকে পরিত্যাগ করি-বার আয়োজন করিতে লাগিল। নীরবে তিনি সংজ্ঞা-শূন্য হইলেন। কোন প্রকার দেহবিকার দেখা গেল না, অতি সহজে আত্মা শরীর ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিল। সাধুর

জীবন এই রূপেই যায়। অতি সহজে, অতি স্বাভাবিক-ভাবে প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়।

শিবচন্দ্র বাবুর ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মশীল জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তিনি যে কিরূপ দানশীল ছিলেন তাহার বিবরণ সে বৃত্তান্তে নাই। যে কেহ কোন অভাবে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎ-ক্ষণাৎ যথাসাধ্য সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন। কত দীন দুঃখীকে যে তিনি গোপনে অর্থদান করি-তেন, তাহা নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনেরাও টের পাইতেন না। সাধারণ হিতকর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনি মুক্ত-হস্তে দান করিতেন। কত দীন দুঃখী আজ তাঁহার অভাবে পিতৃহীন হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল। চেহারা দেখিয়া মনে হইত, হাড় কয়েক খানা চামড়া দিয়া যেন আচ্ছাদন করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এমন দুর্ব্বল শরীরের মধ্যে কি তেজী-য়ান আত্মা বাস করিত! কোন বাধা কোন বিঘ্ন তাঁহাকে সৎসঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেমন পরিশ্রম করিতেন, কোন বলিষ্ঠ যুবকও তেমন খাটিতে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বল যে তুচ্ছ পদার্থ, মনের বলই যে প্রকৃত বল, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যেমন বিনয় দেখিয়াছি, এমন বিনয় আর কাহারও দেখি নাই। অশীতি বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি একজন বালকের কথার প্রতিও কত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই, এমনই সুমিষ্ট তাঁহার ব্যবহার ছিল।

এমন লোক সচরাচর জন্মে না, তাইত কবি সুরধনী কাব্যে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন। ধর্ম্মব্রত, দানব্রত, কর্ম্মব্রত, চরিত্রব্রত শিবচন্দ্র মুক্ত হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার নশ্বর দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অমর জীবন চিরকাল বঙ্গবাসীকে সাধুপথ দেখাইয়া দেবে।"—সঞ্জীবনী।

"পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব—আজ আমরা গভীর শোক সহকারে আমাদের পাঠকবর্গকে ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধেয় এবং সুপরিচিত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এমন আর দ্বিতীয় কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সময়, শরীর, বুদ্ধি এবং অর্থ প্রভৃতি সাহায্য করিবার যে সকল আয়োজন সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে তিনি নিযুক্ত

প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মসমাজের পক্ষে মানুষকে যদি কোন রূপে অভিভাবক শব্দে অভিহিত করা অসঙ্গত না হয়, তবে এই শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভি-ভাবক শব্দে অভিহিত করিতে আমাদের কোন সংকোচ হইতেছে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সময়ে যাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন. শিবচন্দ্র বাবু তাহার মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সেই বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন, তাহাতে যুবক-গণকেও লজ্জিত হইতে হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাস্ত-বিকই তাঁহার পরলোকগমনে একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারা হইলেন। তাঁহার জীবন অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট ছিল। তিনি ছোট বড় সকলেরই সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। নীতি সম্বন্ধে তিনি একজন আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। সময়ের অপব্যবহার তিনি কখনও করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই যথাসময়ে সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। অর্থসম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহার সকলের পক্ষে বিশেষ অনুকরণীয়। তিনি যে সকল সৎকার্য্যে নিয়মিতরূপে অর্থ সাহায্য করিতেন সে অর্থ কখনও তাঁহার নিকট চাহিয়া পাঠাইতে হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজ হইতে আপন দেয় দাতব্য যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন।

শিবচন্দ্র বাবুর ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মশীল জীবনের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই বিবরণে তাঁহার অনেক সৎকার্য্যের উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি রোগ শয্যাতে অতি দুর্ব্বল অবস্থাতেও নিয়মিত উপাসনা করিতে কথনই বিমুখ হন নাই। তিনি যে কিরূপ দানশীল ছিলেন তাহার বিবরণ এই বৃত্তান্তে নাই। যে কেহ কোন অভাবে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কত দীন দুঃখীকে যে তিনি গোপনে অর্থদান করিতেন, তাহা নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনেরাও টের পাইতেন না। সাধারণ হিতকর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কত দীন দুঃখী আজ তাঁহার অভাবে পিতৃহীন হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল। চেহারা দেখিয়া মনে হইত, হাড় কয়েক খানা চামড়া দিয়া যেন আচ্ছাদান করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এমন দুর্ব্বল শরীরের মধ্যে কি তেজীয়ান আত্মা বাস করিত! কোন বাধা, কোন বিঘ্ন তাঁহাকে সৎ সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেমন পরিশ্রম করিতেন, কোন বলিষ্ঠ যুবকও তেমন খাটিতে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বল যে তুচ্ছ পদার্থ,

মনের বলই যে প্রকৃত বল, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যেমন বিনয় দেখিয়াছি, এমন বিনয় অতি অল্প লোকের দৃষ্ট হয়। অশীতি বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি একজন বালকের কথার প্রতিও কত সম্মান প্রদর্শন করিতেন।"—তত্ত্বকৌমুদী।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভা শিবচন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপে আপনাদের দুঃখ প্রকাশ করেন ঃ—

"Resolved that this meeting places on record with profound regret its sense of the great loss the Brahmo community in general, and the S. B. Samaj in particular have suffered by the death of Babu Shib Chandra Deb, who was among the earliest disciples of Raja Rammohan Roy, being the oldest member of the Brahmo Samaj, who in the course of his long career always tried to help in every way the cause of Theism in this country, whose life bore strong testimony to the grandeur, solidity and practicability of an ideal of life, the harmony of godliness with devotion to

secular duties such as have been rarely attained by his contemporaries, and who first as its secretary and then as its president, nursed the infant life of the S. B. Samaj, through the most critical period of its existence, and who even when incapacitated by infirmity and old age from taking any active part in the affairs of the Samaj, was always liberal of his purse and his sage counsel in helping its work."

শিবচন্দ্র অতি ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। চঞ্চলতা বা বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার জীবনে দেখা যায় নাই। তিনি যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তখনই সেই কার্য্য অতি সুদক্ষতার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন।

দয়া, দাক্ষিণ্য, চরিত্রের মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণগুলি মানব-প্রকৃতিতে কত দূর বিকশিত হইতে পারে, শিবচন্দ্রের হৃদয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নীতি সম্বন্ধে তাঁহাকে আদর্শ স্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানুষ কিরূপে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের নানা কর্ত্তব্য নিয়মিত রূপে সম্পাদন করিয়া উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিতে পারে, শিবচন্দ্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর জীবন আমাদের ধর্ম্মপথের সহায় হউক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক
২৪ নং শঙ্করঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।
কলিকাতা, ২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।